রাসূলুল্লাহ (সা.) এর শাফাআত

হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অন্যতম একটি মর্যাদা হলো– আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত বেহেস্তী ও দোজখীদের পৃথক বা পরিচয় করার মানদন্ড স্বরূপ তাঁকে এক অনন্য জওহর হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। প্রথমত: আল্লাহপাক আলমে আরওয়াহ বা রূহজগতে প্রশ্ন করেন- ألست بربكم

অর্থাৎ 'আমি কি তোমাদের পালন কর্তা নই?

এই প্রশ্ন করে তিনি আদম সন্তানদের পরীক্ষা নিয়েছিলেন। তখন সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করে নিয়েছিল এই বলে যে, 'হে খোদা! হাঁ, তুমিই আমাদের রব।' এ স্বীকারোক্তির পর আল্লাহ সকলের চোখের সামনে নূরের আলোর প্রতিফলন ঘটান। সেই নূরের প্রতি যারা একান্ত মুহব্বতের সাথে তাকিয়েছিলেন, তারা হলেন 'মুমিন'। আর যারা মুহব্বতের বিপরীত নফরত বা তাচ্ছিল্যের সাথে তাকিয়েছিল, তারাই হল কাফির। আদম সন্তানদের চোখের উপর নিরূপিত সেই নূর ছিল 'নূরে মুহাম্মদী (সা.)।' আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সাধারণত কাউকে তাঁর ক্ষমতা দিয়ে বেহেস্তী বা দোযখী হিসেবে নির্ধারিত করেন না। বেহেস্তী বা দোযখী নির্ধারিত হওয়ার ব্যাপারে প্রত্যেক বান্দাকে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) হলেন আল্লাহর এমন মানদন্ড যাঁর দ্বারা আল্লাহপাক কাউকে বেহেস্তী বা দোযখী বলে চিহ্নিত করে নেন। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) কে মাধ্যম ছাড়া কোন ব্যক্তিই শুধু ইবাদত দ্বারা বেহেস্তী হতে পারবে না। নতুবা মুনাফিকরা বহু ইবাদত করেও দোযখী হত না। কারণ আল্লাহর উপর ঈমান আনার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রিসালতের উপর ও যথাযথ ঈমান আনতে হবে এবং তাঁর সাথে থাকতে হবে সর্বোচ্চ মুহব্বতের বন্ধন, বলতে গেলে তাঁর সাথের আন্তরিকতা বা মুহব্বতই বেহেস্তী হওয়ার কারণ।

হযরত আদম (আ.) হতে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত যত মানুষ মৃত্যুবরণ করেছেন, তাদের প্রত্যেকের জন্যই কবরে সওয়াল ছিল দুটি। এক. তোমার প্রতিপালক কে? দুই. তোমার ধর্ম কি? নবী করিম (সা.) এর উম্মতের জন্যই কেবল রয়েছে তিনটি প্রশ্ন। আর একটি প্রশ্ন বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য ছিল মুনাফিক চিহ্নিত করা। কারণ অন্য কোন নবীর যামানায় মুনাফিক বলে কেউ ছিল না। শুধু দুটি শ্রেণীই ছিল একটি 'মুমিন' অন্যটি কাফির। শুধু উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্য থেকে মুনাফিক চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে তথা বেহেস্তী ও দোযখী বাছাই করার জন্যই তৃতীয় প্রশ্ন বৃদ্ধি করা হয়েছে। আর এ তৃতীয় প্রশ্নটি হল এমন যে–হুযূর (সা.) কে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করা হয়, এই ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কী জান বা বল? প্রথম দুটি সওয়ালের জবাব দিয়ে ফেললেও যদি তৃতীয় প্রশ্নের জবাব কেউ না দিতে পারে তবে সে ব্যক্তি দোযখী হিসেবে সাব্যস্ত হয়ে যায়।

কিয়ামতের দিন নবী করীম (সা.) কে উঠানো হবে সকলের পূর্বে, তাঁর আগে অন্য কোন লোকই উঠতে পারবেন না।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বাণী : ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ

এর তাফসীরে হাদীস শরীফে উল্লেখ হয়েছে যে, যখন ইসরাফীল (আ.) কে আল্লাহ তৃতীয় বার শিঙ্গা ফুৎকারের হুকুম দিবেন, তখন ইসরাফীল (আ.) আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলবেন 'হে আল্লাহ! আমি ভয় করছি যে, আমার শিঙ্গার আওয়াজে তোমার হাবীব মুহাম্মদ (সা.) আরামের ঘুম থেকে চমকে উঠবেন। এতে তাঁর মন নারাজ হবে, আমি সেই বেয়াদবীতে ধ্বংস হয়ে যাব। হে আল্লাহ! তোমার হাবীবকে প্রথমে মাটির উদর থেকে উঠিয়ে নাও, তারপর আমি শিঙ্গায় ফুঁক দিয়ে তোমার হুকুম তামিল করব'। তখন আল্লাহ ফিরিশতাদের তাঁর হাবীব হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে উঠিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেবেন। এই কাজ সমাধার সাহস কোন ফিরিশতারই হবে না। তাই সবাই মিলে হযরত জিবরীলে আমীনকে বাধ্য করবেন রাসূলুল্লাহ (সা.) কে উঠানোর জন্য। কারণ হিসেবে তারা উল্লেখ করবেন যে, জিবরাঈল (আ.) রাসূলুল্লাহর (সা.) দরবারে বহুবার উপস্থিত হয়েছেন, তাই সকলের চেয়ে তিনিই ভাল অবগত আছেন–কিভাবে শ্রেষ্ঠ নবীর সাথে আদব রক্ষা করতে হয়। জিবরাঈল (আ.) সকল ফিরিশতার জোর দাবীর মুখে বলবেন, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার হাবীবের রওদ্বা শরীফের স্থান পরিচয় করতে পারছি না, আমাকে দয়া করে তা পরিচয় করিয়ে দিন।' আল্লাহপাক বলবেন, 'হে জিবরাঈল আমি আমার হাবীবের রওদ্বার উপরে একটি নূরের খুটি খাড়া করে দিচ্ছি, তুমি তা দেখে আমার হাবীবের রওদ্বা চিনে নেবে। তুমি সেখানে গিয়ে আমার হাবীবকে আহ্বান কর।' যখন হযরত জিবরীলে আমীন সেখানে গিয়ে বলবেন :

إرفع رأسك يا محمد

-হে মুহাম্মদ (সা.) আপনার মুবারক মস্তক উত্তোলন করুন।'

হুযূর (সা.) বলেন যে, আমি ঘুম থেকে উঠে জিজ্ঞেস করব– তুমি কে! আমাকে আরাম থেকে উঠালে? জিবরাঈল (আ.) বলবেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.) আমি আপনার পুরানো খাদিম জিবরাঈল। রাসূলে পাক (সা.) বলেন, সে সময় আমি জিজ্ঞাসা করব আমাকে আরাম থেকে উঠানোর কারণ কী? জিবরাঈল (আ.) বলবেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.) কিয়ামত শুরু হয়ে গেছে তাই আমি আপনাকে জাগিয়েছি। হুযূর পাক (সা.) বলেন- আমি চারদিকে তাকিয়ে মাঠে যখন কোন লোককে দেখব না, তখন জিজ্ঞেস করব– হে জিবরাঈল, তুমি কি আমার উম্মতকে পুলসিরাতের উপর রেখে আমাকে উঠিয়েছ। জিবরাঈল উত্তর দেবেন–ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.) শপথ সে সত্ত্বার! যিনি আপনাকে নবী রূপে প্রেরণ করেছেন, আসল কথা হল এ পর্যন্ত কোন ব্যক্তিকেই উঠানো হয়নি। হুযূর পাক (সা.) বলেন–আমি তাড়াতাড়ি আরশের কাছে গিয়ে দেখব যে, হযরত মূসা (আ.) আরশের পায়া ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি বলতে পারবো না তাকে আমার আগে উঠানো হয়েছে নাকি তাঁকে আদৌ বেহুশ করা হয়নি। কারণ তাকে দুনিয়ায় একবার বেহুশ করা হয়েছিল।

হুযূর (সা.) আরও বলেন–আমি তখন সেখানে সিজদায় পড়ে যাব। আল্লাহর এমন প্রশংসা করব যা আজ আমার জানা নেই। আল্লাহপাক আমাকে তখনই তা শিখিয়ে দিবেন। পরে আল্লাহ বলবেন–

إرفع رأسك يا محمد سل تعط اشفع تشفع

-'হে মুহাম্মদ, আপনি মাথা উঠান, আজ আপনি যা সওয়াল করবেন তা ফিরানো হবে না। যে শাফায়াত করবেন তা গৃহীত হবে' হুযূর (সা.) মাথা উঠিয়ে

বলবেন : হে আল্লাহ, আমি আমার উম্মতের মুক্তি চাই।‘

নবী করীম (সা.) বলেন, তারপর আমার হাতে লিওয়ায়ে হামদ দেয়া হবে। এই ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে আমি আরশের ছায়ায় দাঁড়াবো।

যদিও হাদীসের সনদে দুর্বলতা রয়েছে তবুও এই হাদীস আইয়্যামে সিয়র নকল করেন যে, “আরশের ছায়ায় আমি হযরত বেলালকে দেখব। বেলালকে বলব–হে বেলাল তুমি আজান দাও। তোমার আজান শুনে আমার উম্মত সকলে জমা হয়ে যাবে আমার নিকট। তারপর আমার উম্মতকে বাছাই করতে শুরু করব। ওযু, সিজদা ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নূরের চমক দেখে আমি আমার উম্মতকে বাছাই করব। শেষ পর্যন্ত মীযানের ধারে আমার উম্মতকে বাছাই করার জন্য আমাকে দাঁড় করানো হবে।

আল্লাহর আইন হলো ‘যার সওয়াবের পাল্লা ভারী হবে সে বেহেশতী হবে এবং যার গুণাহের পাল্লা ভারী হবে সে দোযখী হবে।” কিন্তু হুযূর (সা.) যাকে উম্মত হিসেবে পরিচয় করে নেবেন তার জন্য এ আইন ব্যবহার করা হবে না। কেবল রাসূলে পাক (সা.) যাদের উম্মত বলে পরিচয় করতে পারবেন না তারাই দোযখে যাবে।

মুসলমান দোযখীরা দোযখে যাবার কারণ দর্শাবে। কোরআনের ভাষায় তারা বলবে– “আমরা নামাযী ছিলাম না এবং অনাহারীদের খাদ্য দান করিনি, সমালোচকদের সাথে সমালোচনায় শামিল হতাম এবং আমরা কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করতাম।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাক্ষীর উপর বেহেশতে যাওয়া নির্ভর করে। আল্লাহ তাআলা বলেন- وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً

দোযখের ভেতরে দোযখীরা দু’লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বৎসর পর্যন্ত চিৎকার করতে থাকবে। প্রতি পঞ্চাশ হাজার বৎসর এক কথা বলেই চিৎকার করবে। প্রথম ৫০ হাজার বৎসর-

ربنا أرنا اللذَيْن أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين

বলে চিৎকার করতে থাকবে। তারপর আল্লাহ এক উত্তর দিবেন। এভাবে একেকটি কথা পঞ্চাশ হাজার বৎসর করে চিৎকার করবে আর আল্লাহ একেকটি একটি উত্তর দেবেন। শেষ পঞ্চাশ হাজার বৎসরে দোযখীরা বলবে- رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ

এরপর আল্লাহ এর উত্তর দিবেন : قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ

সে সময় কাফিরদের মন হতে আল্লাহর রহমতের আশা ছুটে যাবে। মাথা নিচু করে তারা মুসলমানদের বলবে–হে মুসলমানরা, তোমরাও দেখি আমাদের সঙ্গে রয়ে গেলে। তোমাদের নবী কি তোমাদের শাফাআত করে বের করলেন না। সে কথা শুনে আল্লাহর খুবই লজ্জা হবে, এক বর্ণনানুযায়ী আল্লাহ নিজে ডাকবেন, হে মুসলমানরা, তোমরা সবাই দোযখ থেকে বের হয়ে আস। দ্বিতীয় বর্ণনানুযায়ী আল্লাহ তাআলা হুযূর (সা.) কে বলবেন–হে আমার হাবীব। আপনি দোযখের দরোজায় গিয়ে মুসলমানদের ডেকে নিয়ে আসুন। আমি একজন মুসলমানকেও আর দোযখে রাখব না। যখন সব মুসলমান বের হয়ে যাবেন, তখন কাফিররা বলবে হায়! আফসোস, আজ আমরা মুসলমান হয়ে থাকলে এদের সাথে বের হতে পারতাম। সে কথা কুরআন শরীফে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন।

দোযখ হতে শেষ ব্যক্তিকে বের করা হবে, যখন হুযূর (সা.) শান্ত হয়ে যাবেন যে তাঁর কোনো উম্মত আর দোযখে থাকছে না; সে সময় দোযখের ভেতর থেকে একটি শব্দ হুযূর (সা.) শুনতে পাবেন যে কোনো ব্যক্তি দোযখের ভেতর থেকে আল্লাহর নাম ধরে চিৎকার করছে। শুনে তিনি দোযখের দরজায় গিয়ে বলবেন, হে খাযিন দোযখের ভেতর আমার কোন উম্মত রয়ে গেছে তাকে বের করে দাও। খাযিন ফেরেশতাদের বলে দিবেন দোযখের ভেতর সন্ধান নিয়ে দেখ আল্লাহর হাবীবের কোনো উম্মত কোথায় রয়ে গেছে। ফেরেশতারা তালাশ করে এসে বলবেন, হে খাযিন! দোযখে উম্মতে মুহাম্মদীর কোনো ব্যক্তি নেই। সে উত্তর শুনে হুযূর (সা.) বলবেন, হে খাযিন! নিশ্চয় দোযখে আমার কোন উম্মত রয়ে গেছে। আমি শুনেছি যে, কোনো ব্যক্তি দোযখে আল্লাহর নাম ধরে চিৎকার করছে। তাই সারা দোযখ ঘুরে দেখ কোথায় আমার উম্মত রয়ে গেছে? কারণ আমার উম্মত ব্যতিত দোযখে আল্লাহর নাম ধরে কেউ চিৎকার করবে না। সে সময় খাযিন ফেরেশতাদের বলবেন, হে ফেরেশতারা, তোমাদের কি লজ্জা করে না যে রাহমাতুললিল আলামীন দোযখের দরজায় দাঁড়ানো। তোমরা সর্বত্র তালাশ করে দেখ তাঁর উম্মত কোথায় রয়ে গেছে। সে সময় ফেরেশতারা তালাশ করে জলন্ত অঙ্গারের মতো এক ব্যক্তিকে নিয়ে বের হবেন। হুযূর (সা.) তাকে দেখে কেঁদে বলবেন–হে আমার প্রিয় উম্মত, এতদিন যাবত আল্লাহর নাম ধরে কেন চিৎকার করলে না। তাহলে তো অনেক আগেই বের হয়ে যেতে। সে উত্তর দিবে ইয়া রসূলাল্লাহ (সা.), দুনিয়ার জীবনে আমি আল্লাহকে ভুলে রয়েছিলাম তাই এখানে আল্লাহ আমাকে তাঁর নাম ভুলিয়ে রাখেন এবং এখন দয়া করে তা স্মরণ করে দেয়াতে আমি তাঁর নাম ধরে ডেকেছি। এ ব্যক্তিকে হুযূর (সা.) নিজে হাত দিয়ে নহরে গোসল করিয়ে তাজা চামড়া বের করে বেহেশতের কিনারায় রাখবেন। সে ব্যক্তি গাছের ছায়া দেখে বলবে আমাকে এই ছায়া পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিন। তারপর অন্যান্য নিয়ামত দেখেও অনুরূপ ইচ্ছা করবে। এভাবে ক্রমান্বয়ে বেহেশতে পুরোপুরি ঢুকে পড়বে। হাদীস শরীফে রয়েছে যে, এ ব্যক্তিকে যে বেহেশত দেয়া হবে তা হবে এ দুনিয়ার চেয়ে দ্বিগুণবড়।

মোট কথা, দুনিয়াবাসীর হিদায়াত ও নাজাতের জন্য যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন, পরকালের সেই ভয়াল দিনেও তিনিই হবেন মুক্তির মাধ্যম। নবীপাক উম্মতের কাণ্ডারী হয়ে পাপী উম্মতের জন্য মুক্তির পথ খোলাসা করবেন। তাঁর পরিচয় জানা ও তাঁকে সনাক্ত করণের মাধ্যমেই বেহেশতে যাওয়া সম্ভব নতুবা নয়।

[মাসিক পরওয়ানা, জানুয়ারি ১৯৯৫]

[স্মারক : হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.), ২০১৩]